ধানচাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা
Water Managemant for rice production

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)
গাজীপুর।

ধানচাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা
Water Managemant for rice production

রচনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়
ড. মো: জহিরুল ইসলাম, ড. মো: ইসলাম উদ্দিন মোল্লা, ড. মো: ফজলুল ইসলাম ও মো: শাহাদাত হোসেন

কারিগরী সহায়তায়
বিআরকেবি ওয়ার্কিং গ্রুপ

আর্থিক সহায়তায়
বিআরকেবি-ব্রি-এনএটিপি-বিএআরসি উপ-প্রকল্প

পরিকল্পনা, গবেষণা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. মো: ইসলাম উদ্দিন মোল্লা

ডিজাইনে
মো: আব্দুল মান্নান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর।

ধানচাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	ধান গাছে পানির প্রয়োজনীয়তা	১
২.	ধান চাষের গুরুত্ব	১
৩.	ধান চাষে সেচের গুরুত্ব	১
৪.	সেচ ও সেচের উৎস	২
৫.	ধান চাষের বিভিন্ন পরিবেশ বা মৌসুম	২
৬.	ধান চাষে পানির চাহিদা ও পরিমাণ	৩
৭.	ধান চাষে বৃষ্টির প্রভাব	৩
৮.	রোপা আমন ধানে সম্পূরক সেচ	৩
৯.	সম্পূরক সেচের পানির উৎসসমূহ	৪
১০.	সেচের পানির অপচয়	৪
১১.	নালা দূরমুজকরণ	৫
১২.	পাকা নালা	৫
১৩.	পাইপ সেচ বিতরণ ব্যবস্থা	৫
১৪.	ধান উৎপাদনে সেচের পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি	৬
১৫.	সেচের পানি ব্যবস্থাপনা	৬
১৬.	পর্যায়ক্রমে সেচ	৭
১৭.	সেচের পূর্বে করণীয়	৭
১৮.	ধান গাছের জীবন পর্যায় ও স্তর অনুসারে পানির প্রয়োজনীয়তা	৮
১৯.	লবণাক্ত এলাকায় ধানচাষ	৯
২০.	বিভিন্ন ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা	৯

ধান চাষে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

১. ধান গাছে পানির প্রয়োজনীয়তা

পানির অপর নাম জীবন। ধান গাছের ক্ষেত্রেও এ বাক্যটি সমভাবে প্রযোজ্য এবং এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। গাছে বিভিন্নভাবে পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-

গভীর নলকূপ

ক. পানি দেহকোষের অত্যাবশ্যক উপাদান।
খ. এটি ধান গাছের শরীর গঠন ও অবয়ব রক্ষা করে।
গ. পানি গাছের খাদ্য উপাদানগুলোকে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উপনিত করে।
ঘ. পানি শিকড়ের মাধ্যমে খাদ্য আহরণ করে গাছের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছে দেয়।
ঙ. পানি রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান ।
চ. পানি জৈব, অজৈব পদার্থ ও গ্যাস উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে পৌঁছে দেয়।
ছ. এটি স্ফীতিরস (Turgidity) তৈরি করে গাছের যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical strength) প্রদান করে থাকে।
জ. পানি আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও দমনে সহায়তা করে।
ঝ. রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনে সাহায্য করে।

২. ধান চাষের গুরুত্ব

বাংলাদেশে প্রায় ১৪.২ মিলিয়ন হেক্টর জমি আছে। ধান বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল এবং খাদ্য। তিন মৌসুমেই ধান চাষাবাদ হয়ে থাকে এবং মোট আবাদি জমির প্রায় ৭৭% অর্থাৎ ১০.৯ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ধানের চাষ হয়। বর্তমানে মোট উৎপাদিত খাদ্য শস্যের প্রায় ৯২% ধান। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে খাদ্যের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অপরদিকে, অপরিকল্পিত গৃহায়ন, নগরায়ন, শিল্প কারখানা ও রাস্তঘাট তৈরির জন্য মূল্যবান কৃষি জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, অবশিষ্ট অল্প জমি থেকে এবং অল্প পানি ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দিনের খাদ্য চাহিদা মিটানোর কলাকৌশল গ্রহণ করতে হবে। আর সে জন্য প্রয়োজন মূল্যবান পানির সম্পদের অপচয় রোধ করে সঠিক ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

৩. ধান চাষে সেচের গুরুতব

ধান চাষে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে আবাদি জমির শতকরা ৪৬ ভাগ সেচের আওতাভূক্ত। আবার মোট সেচের ৮০% ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। মোট ধান সেচের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ব্যবহার করা হয় শুষ্ক বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদনে। অন্য যে কোন ফসলের চেয়ে ধান চাষে অধিক পানির প্রয়োজন হয়। আবার উফশী জাতের পানির প্রয়োজনীয়তা দেশী জাত থেকে বেশি। পানির মাধ্যমে গাছ তার খাদ্য দ্রবণাকারে মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করে থাকে। গাছ যে পানি আহরণ করে, তার মাত্র শতকরা ৫ ভাগ শরীর গঠন ও স্ফীতরস (Turgidity) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকি ৯৫ ভাগ বাতাস শুষে নেয়। বাষ্পীভবন, ত্বক দিয়ে নিঃসরণ এবং মাটি চুঁইয়ে জমি ও গাছ থেকে যে পরিমাণ পানি অপচয় হয়, সে অভাব পূরণ করার জন্য সেচের প্রয়োজন হয়। মাটিতে রসের অভাব হলে এবং সেচের মাধ্যমে সেই অভাব পূরণ করা না গেলে গাছের বাড়-বাড়তি তথা শরীর গঠন ব্যাহত হয়ে ফলন কমে যায় এমনকি গাছ শুকিয়ে মরেও যেতে পারে। তাই কাঙ্খিত ফলনের জন্য সেচের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

অগভীর নলকূপ

৪. সেচ ও সেচের উৎস

নদী থেকে সেচ

সেচ বলতে সাধারণত কৃত্রিমভাবে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করাকে বোঝায়। সময়মত ও পরিমিত পরিমাণ পানি সরবরাহের উপর সেচের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণত ধানের সেচের উৎস দুটি। একটি ভূ-উপরস্থ এবং অন্যটি ভূগর্ভস্থ পানি। ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহার করে মধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে (Gravity flow) পাওয়ার পাম্প ও সনাতন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হয়। অপরদিকে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে গভীর ও অগভীর নলকূপ দিয়ে সেচ প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের যে সেচব্যবস্থা, তা ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। এটা খাল-বিল, নদী-নালার দেশ কিন্তু এই পানি সম্পদ কৃষিতে ব্যবহার করা হয় খুবই কম। বিএডিসির তথ্য মতে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করা হয় সেচের আওতাধীন জমির মাত্র ২১ শতাংশ আর ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয় বাকি ৭৯ শতাংশ জমিতে। এর মধ্যে গভীর নলকূপ দিয়ে ১৫ শতাংশ জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং প্রায় ৬৪ শতাংশ জমিতে সেচ দেয়া হয় অগভীর নলকূপ দিয়ে।

৫. ধান চাষের বিভিন্ন পরিবেশ বা মৌসুম

চাষাবাদ এলাকার জলবায়ূ ও পানি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ধান চাষের পরিবেশকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, যেমন- ক. সেচ নির্ভর বোরো মৌসুম, খ. বৃষ্টি নির্ভর আউশ মৌসুম, গ. বৃষ্টি + সম্পূরক সেচ নির্ভর রোপা আমন মৌসুম ও ঘ.বন্যা প্রবণ বোনা আমন মৌসুম।

ক. বোরো মৌসুমঃএ মৌসুমে ধান চাষের প্রথম থেকে শেষ পর্যমত্ম ছিপছিপে ও দাঁড়ানো পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খরার প্রভাব এড়ানোর জন্য পুরো মৌসুমের শতকরা ৮০ ভাগ সময়ে দাঁড়ানো পানি রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। নিশ্চিত পানি ও সারসহ অন্যান্য উপাদান ব্যবহারের ফলে এবং অধিক সূর্যের আলো পায় বিধায় বোরোতে অন্যান্য মৌসুম থেকে ফলন বেশি হয়।

খ. আউশ মৌসুমঃআউশ ধানের জমিতে শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশি সময় দাঁড়ানো পানি থাকে না। আউশ মৌসুম সম্পূর্ণ বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এ মৌসুমের বেশির ভাগ সময় বৃষ্টির অভাবে জমি শুকিয়ে যায় এবং প্রায়ই খরাক্রান্ত হয় বিধায়ফলন কম হয়।

গ. রোপা আমন মৌসুমঃএ মৌসুমে বৎসরের বৃষ্টিপাত বেশি হয়ে থাকে এবং ধান চাষ সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাই ধান চাষের পুরো সময় মাটি ভিজা ভিজাথাকে বলে ফলন আউশের চেয়ে বেশি।

ঘ. বোনা আমন মৌসুমঃএ মৌসুমে প্রথম দিকে বৃষ্টির অভাবে খরা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তিতে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং পাহাড়ী ঢলে প্রায়ই বন্যায় পস্নাবিত হয়। এমতাবস্থায় ধানের জমি ২৫-৩০ সেন্টিমিটার বন্যার পানিতে একাধারে ১০-১৫ দিন তলিয়ে থাকে । তাছাড়া, কোন কোন এলাকায় বোনা আমন ধানের ক্ষেত ১-৬ মিটার গভীর পানিতে দীর্ঘ দিন (২-৩ মাস) তলিয়ে থাকে এবং ধান গাছ পানির উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে বলে এ ধানকে গভীর পানির বা ভাসমান ধান বলা হয়। এ মৌসুমের কোন উফশী জাত নাই বিধায় অন্য মৌসুম থেকে ফলন অনেক কম।

খাদ্য শস্যের মধ্যে একমাত্র ধানই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি এবং পরিবেশে অর্থাৎ মাটির শুকনো অবস্থা থেকে ৬ মিটার পানির উচ্চতায় সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। তাই এ বৈচিত্রময় জীবন ধারণে সক্ষম ধান গাছকে কেউ কেউ অর্ধজলজ (Semi aquatic) উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য করে থাকে। খাদ্য শস্যের মধ্যে একমাত্র ধান গাছেই এ গুণাগুণ বিদ্যমান থাকায় সারা বৎসরই ধান চাষ করা যায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অল্প জমিতে অধিক ফসল পাওয়ার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তুলা সম্ভব হয়েছে।

৬. ধান চাষে পানির চাহিদা ও পরিমাণ

সাধারণত মৌসুম ভেদে ধান চাষে ৮৭৫-১৫০০ মিলিমিটার পানির প্রয়োজন হয়। বোরো মৌসুমে মাটির প্রকার ভেদে ১২০০-১৫০০ মিমি পানি লাগে। তবে বর্ষাকালে ধান গাছের দৈনিক গড়ে প্রায় ৪-৫ মিমি এবং শুষ্ক মৌসুমে ৫-৭ মিমি পানির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কারণে এ পরিমাণ কম বেশি হতে পারে। সেচের মাধ্যমে ধান চাষে যে পরিমাণ পানি প্রয়োগ হয় তা সাধারণত চারা ও জমি তৈরি এবং গাছ বর্ধণের সময় ব্যবহৃত হয়ে থকে। বোরো মৌসুমে মোট ১৫০০ মিমি পানির মধ্যে চারা ও জমি তৈরিতে প্রয়োজন হয় ৩০০ মিমি এবং বাকি ১২০০ মিমি ধান উৎপাদনকালিন সময় মাঠে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে আউশ ও আমনে চারা ও জমি তৈরিতে প্রয়োজন ৩০০ মিমি পানি এবং বাকি পানির প্রয়োজন হয় গাছের বর্ধণশীল ও অন্যান্য পর্যায়ে।

৭. ধান চাষে বৃষ্টির প্রভাব

বৃষ্টিপাতের ধরন, পরিমাণ, আরম্ভ এবং শেষ ধান চাষকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। যদিও বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ২১০০ মিমি তবে কোন কোন বৎসর ১৪০০-৫০০০ মিমি পর্যমন্ত হয়ে থাকে। দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বৃষ্টিপাতের তারতম্য হয়ে থাকে এমনকি কোন বৎসরই বৃষ্টিপাত সমভাবে বর্ষে না। সাধারণত ফাল্গুন- চৈত্র মাসে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে বৎসরের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮০ ভাগ হয়ে থাকে। তাতে করে উক্ত সময়ে প্রতিমাসে প্রায় ৪০০ মিমি বৃষ্টিপাত আশা করা যায়। যা ধান উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ থেকে বেশি। কারণ প্রতি মাসে গড়ে ১৮০-৩০০ মিমি বৃষ্টিপাতই ধান চাষের জন্য যথেষ্ট। সাধারণত আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তা ধান ফসলের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। তবে কার্তিক মাসে যখন আমন ধান ফুল থেকে দুধ অবস্থায় থাকে তখন গড়ে ১৫০ মিমি (১০০-২০০ মিমি) বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে যা ধানের জন্য যথেষ্ট নয় এবং তা আবার সমভাবে বর্ষে না। তাই কাঙ্খিত ফলনের জন্য সম্পূরক সেচের প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত শীতের মাসগুলি বাদ দিলে প্রায়ই খরা পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় শুষ্ক মৌসুমে ধানের ভাল ফলন পেতে হলে সেচ একটি পূর্বশর্ত। এমনকি বৃষ্টির অভাবে আউশ এবং আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা না থাকলে সময়মত চাষ ও খরা মোকাবেলার অভাবে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া সম্ভব নয়।

৮. রোপা আমন ধানে সম্পূরক সেচ

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

ধান উৎপাদনে রোপা আমনের গুরুত্বঃ ধান উৎপাদনে রোপা আমনের গুরুত্ব অপরিসীম। মোট ধানি জমির শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে রোপা আমন ধানের চাষ করা হয় এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০ ভাগ আসে আমন চাষাবাদ থেকে। যদিও বর্তমানে সারা দেশে আবাদি জমির প্রায় ৪৬% জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ১১% জমি আমন মৌসুমে সেচ দেয়া হয়। তাই বলা চলে আমন চাষাবাদ অনেকটা বৃষ্টিনির্ভর। বাংলাদেশে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২১০০ মিমি। আমন মৌসুমে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০% হয়ে থাকে যা আমন ফসল আবাদের জন্য যথেষ্ট। তবে প্রতি বৎসরই এর তারতম্য লক্ষ্য করা যায় এবং সকল স্থানে সমভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। ফলে প্রায়ই আমন ফসল খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। আমন মৌসুমে প্রাথমিক পর্যায়ে বৃষ্টিপাত থেকেই পানির চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। কিন্তু মধ্য কার্তিকের (অক্টোবর) পরে ধানের শিষ বাহির হওয়া/ফুল ফোটা/দুধ অবস্থায় আর বৃষ্টিপাত না হলে তখন সেচ দিতে না পারলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায়, সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করা গেলে ধান চাষ বেশ লাভজনক হয়।

সম্পূরক সেচের পূর্ব প্রস্তুতিঃসম্পূরক সেচের জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় সেচ বা পানির উৎস নিকটে থাকা স্বত্বেও আমন ফসল খরায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ তখন পানির কোন অভাব থাকে না, তবে এর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজন। প্রয়োজন মোতাবেক তাৎক্ষনিক সেচ প্রয়োগের উপাদানসমূহ যেমন- সেচ যন্ত্র, নালা, শ্রমিক, আর্থিক এবং মানসিক প্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন। সম্পূরক সেচের সংখ্যা ও সেচ প্রয়োগের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্য বৃষ্টিপাতের ধরন ও খরার তীব্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

সেচের পরিমাণ ও লাভঃ খরার উপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুসারে ২ থেকে ৩টি সেচের মাধ্যমে ১৬০-২৩০ মিমি পানি প্রয়োগ করে বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ থেকে ৪০-৫০% বেশি ফলন পাওয়া যায়। এমনও দেখা গেছে খরার তীব্রতা অনুসারে শুধুমাত্র একটি সেচের মাধ্যমে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ ফলন বাড়ানো সম্ভব।

৯. সম্পূরক সেচের পানির উৎসসমূহ

গভীর ও অগভীর নলকূপঃ গভীর ও অগভীর নলকূপ দিয়ে সাধারণত বোরো মৌসুমে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। আমন মৌসুমেও খরার সময় পাম্পগুলো বিশেষ করে গভীর নলকূপ মাঠেই থাকে এবং সেগুলো ব্যবহার করে সেচের মাধ্যমে অতি সহজে খরা মোকাবেলা করা যায়।

ডোবা, নালা ও খাল বিলের পানি ব্যবহারঃ আমন মৌসুমে খরা মোকাবেলায় নিকটস্থ ডোবা, নালা ও খাল বিলের জমে থাকা পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ তখন পানির কোন অভাব থাকে না।

পুকুরের পানি ব্যবহার করেঃ প্রয়োজনে এলাকার পুকুরে বর্ষার পানি সংরক্ষণ করে খরা মোকাবেলা করা যায়। তাছাড়া পুকুরে মাছ চাষ করে আরো লাভবান হওয়া যায়।

মাঠে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করেঃ সমতল জমির এক কোনে ছোট্ট একটি গর্ত তৈরি করে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে প্রয়োজনে তা সেচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গর্তটি ২ মিটার গভীর এবং জমির ৫% সম পরিমাণ হতে পারে। উক্ত গর্ত থেকে অনায়াসে ৬০ মিমি একটি সেচ জমিতে দেয়া যেতে পারে।

জমির আইল ব্যবস্থাপনাঃ আইল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি ধরে রেখে খরা প্রতিরোধ করা যায়। আইলের সুষ্ঠু মেরামত ও উচ্চতা বাড়িয়ে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের কার্যকারিতা বাড়ানো যায়। আমনের জমির আইল ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু করে প্রতিনিয়ত আইল পরিচর্যার মাধ্যমে জমানো বৃষ্টির পানির কার্যকারিতা ৯০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। এ পানি ব্যবহার করে সাময়িক খরা প্রতিরোধ করা সহ ২০-২৫% পর্যন্ত ফলন বাড়ানো যায়। তবে নিয়মিত ভাবে আইলের পরিচর্যা ও মেরামতের প্রয়োজন হয়। এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকলে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ধান চাষ লাভজনক পর্যায়ে আনা সম্ভব।

আইল ব্যবস্থাপনা

১০. সেচের পানি অপচয়

প্রায় সকল সেচ প্রকল্পেই সেচের উৎস থেকে যে পরিমাণ পানি সরবরাহ করা হয় ফসলের মাঠ পর্যমন্ত সে পরিমাণ পানি পৌঁছে না। সেচের উৎস থেকে মাঠ পর্যন্ত পৌঁছতে যে পরিমাণ পানি অপচয় হয় তাকে সেচের পানির পরিবহন অপচয় বলে। তাছাড়া মাঠে পৌঁছার পরেও কিছু পানি অপচয় হয়, যেমন আইলের উপর দিয়ে অন্য জমিতে চলে যাওয়া কিংবা মাটির মধ্য দিয়ে চুইয়ে নিচে চলে যাওয়া। আবার কিছু পানি রোদের তাপে বাষ্প হয়ে বাতাসে মিশে যায়। এ সবই সেচের পানির অপচয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক যথাযথভাবে সেচ পদ্ধতি মেনে চলে না এবং সেচ মৌসুমে মাঠ নালা ঠিকমত সংস্কার ও পরিষ্কার না করেই সেচের পানি জমিতে সরবরাহ করে থাকে। ফলশ্রুতিতে সেচের পানির অধিক অপচয় হয়ে থাকে। এতে শতকরা ২৫-৫০ ভাগ সেচের পানির অপচয় হয়। অতএব, মাঠ নালা সংস্কার করে উন্নত সেচ বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সঠিকভাবে মাঠ নালা পরিচর্যার মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করা যায়।

সেচের পানির পরিবহন অপচয় রোধের কৌশলঃ সুষ্ঠু সেচ বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অপচয় রোধে সাশ্রয়কৃত পানি দিয়ে অতিরিক্ত জমি চাষের মাধ্যমে সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিতরণ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে ঝর্ণা পদ্ধতি, ভূ-গর্ভস্থ পাইপ পদ্ধতি, উন্নত কাঁচা নালা, পাকা নালা ও পস্নাস্টিক পাইপ পদ্ধতির মাধ্যমে সেচের পানির পরিবহন অপচয় অনেকাংশে কমানো যায়।

১১. নালা দূরমুজকরণ

সাধারণত কাঁচা নালা দূরমুজকরণের মাধ্যমে উন্নত করা যায় যা সেচের পানির অপচয় হ্রাস করে ও নালার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে নালাটি সাধারণভাবে তৈরি করা হয়। অতপর দূরমুজ করে নালাটিকে শক্ত ও পরিপাটি করে স্থায়ীরূপ দিতে হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে তৈরি মাটির সেচ নালার তুলনায় দূরমুজ করা নালার মাধ্যমে সেচ দিলে প্রায় ২৫ ভাগ পানির অপচয় রোধ করা যায় এবং উক্ত পানি দ্বারা শতকরা ১০ ভাগ অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব।

১২. পাকা নালা

বেলে মাটি এলাকার জন্য পাকা নালা বিশেষভাবে উপযোগী এবং দীর্ঘস্থায়ী। পাকা নালা প্রায় ১০-১৫ বৎসর ব্যবহার করা যায় তবে নিয়মিত মেরামত করতে হয়। পাকা নালার মাধ্যমে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ পানির অপচয় কমানো যায়। তবে খরচ বেশি হওয়ায় এ ধরণের নালার ব্যবহার অত্যমত্ম কম।

পাকা নালা

১৩. পাইপ সেচ বিতরণ ব্যবস্থা

সেচের পানির উৎস থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি সরাসরি জমিতে বা নিকটবর্তী নালায় সরবরাহ করা যায়। এ পদ্ধতি সব ধরনের মাটির জন্য উপযোগী এবং এতে মাঠ নালা না করার কারণে শতকরা ২-৪ ভাগ জমির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। ইহা সহজেই উঁচু নিচু জমিতে পানি বিতরণের জন্য ব্যবহার করা যায়। এর মাধ্যমে কাঁচা নালা দিয়ে সেচ বিতরণ অপচয়ের প্রায় শতকরা ৯৪-৯৮ ভাগ সাশ্রয় করা যায় এবং ৫০% সময় বাঁচে। এ ধরনের বিতরণ ব্যবস্থা স্থাপন করে সাধারণ কাঁচা নালার তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০-৩৫ ভাগ সেচ এলাকা বাড়ানো যায়। পাইপ সেচ বিতরণ ব্যবস্থার দুটি পদ্ধতি আছে, যেমন-

ক. ভূগর্ভস্থ (বারিড) পাইপ পদ্ধতিঃপাম্প থেকে সরাসরি পানি পরিবহনের জন্য মাটির নিচে পিভিসি বা আরসিসি পাইপ স্থাপন করা হয়। পাইপে প্রেসারের মাধ্যমে পানি প্রবাহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে পানির পরিবহনজনিত অপচয় খুবই কম। এটি সমতল বা সামান্য উঁচু-নিচু যে কোন জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় স্থানে দ্রুততার সাথে পানি পৌঁছে যায়। এ পদ্ধতি স্থাপন ও পরিচালনার জন্য দক্ষ কারিগরি জ্ঞান থাকতে হয়। তাছাড়া ইচ্ছামাফিক পাইপের অবস্থান পরিবর্তন করা যায় না।

খ. ভূপৃষ্ঠস্থ পাইপ পদ্ধতিঃপাম্প থেকে পানি পরিবহনের জন্য মাটির উপরে পাইপ স্থাপন করা হয়। পিভিসি, প্লাস্টিক বা পলিথিন পাইপ দিয়ে এ সেচ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। প্রয়োজনে মাঠের বিভিন্ন দিকে পাইপ স্থানামত্মর করে সেচের পানি পরিবহন করা যায়। ফলে অল্প পাইপ দিয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক এলাকায় সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিতে পাইপ লাইন স্থাপন করা খুবই সহজ এবং মৌসুম শেষে পাইপ গুটিয়ে রাখা যায়। তাছাড়া, আরো কিছু পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব। যেমন-

ক. সরাসরি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব নয়। তবে পানি পরিবহনের রাসত্মা বা নালা যদি প্রস্থ না করে সংকুচিত করে নির্মাণ করা হয় তবে বাষ্পীভবনের পরিমাণ কমানো যায়।

খ. ঘাসের ত্বক দিয়ে নিঃস্বরণজনিত পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব যদি নালার ঘাস সবসময় পরিষ্কার রাখা যায়।

গ. নালার পাড়ের কাছাকাছি গর্ত করে মাটি দিয়ে পাড় বাধা উচিত নয়। কারণ এতে চুয়াঁনোর মাধ্যমে পানির অপচয় বেশি হবে।

ঘ. প্রত্যেক জমির পাশে প্লট নালা তৈরি করা উচিত।

ঙ. প্রত্যেক জমিতে প্রয়োজনমাফিক আইল থাকা উচিত।

চ. জমিতে প্রয়োজনের বেশি পানি নেয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

ছ. নালা উপচিয়ে এবংচুয়িঁয়ে যে পরিমাণ পানির অপচয় হয় তা সংগ্রহ করে পুণরায় ব্যবহার করা উচিত।

জ. ধান ক্ষেতে সবসময় পানি আটকিয়ে রাখা বা দাঁড়ানো পানি রাখার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

সেচের পানির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সেচের খরচও বেড়ে চলেছে। তাছাড়া শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে অনেক জমি পতিত থাকে। কাজেই উন্নত সেচ বিতরণ পদ্ধতির মাধ্যমে সীমিত পানি দ্বারা অধিক এলাকায় সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিই এর উদ্দেশ্য। সে জন্য সেচের পানির অপচয় কমানোর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহর প্রয়োগ বাড়াতে হবে।

১৪. ধান উৎপাদনে সেচের পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি (AWD)

এডব্লিউ পদ্ধতি

গবেষণায় দেখা গেছে ধানের জমিতে সব সময় দাঁড়ানো পানি রাখার প্রয়োজন নেই।

চারা রোপণের পর ১০-১৫ দিন পর্যমন্ত জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। তারপরে পর্যায়ক্রমে ভিজানো-শুকানো, Alternate Wetting and Drying (AWD) পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে। এডব্লিউডি পদ্ধতি হলো জমিতে পর্যায়ক্রমে ভিজানো ও শুকানোর মাধ্যমে ধান ক্ষেতে প্রয়োজন মাফিক নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত সেচ প্রদান করা। ধান ক্ষেতে একটি ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিক বা বাঁশের পাইপ বসিয়ে মাটির পানির সত্মর পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজন মত সেচ দেয়াই হলো এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এ পদ্ধতিতে ২৫ সেমি লম্বা এবং ৭-১০ সেমি ব্যাসের একটি ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিক বা বাঁশের পাইপ ধানের জমিতে গর্ত করে খাড়াভাবে স্থাপন করতে হয়। পাইপের উপরের ১০ সেমি ছিদ্রবিহীন এবং নিচের ১৫ সেমি ছিদ্রযুক্ত। পাইপটিতে ড্রিল দিয়ে ৫ সেমি পর পর ৩ সুতি ব্যাসের ছিদ্র করতে হবে। পাইপটি এমনভাবে ধান ক্ষেতে বসাতে হবে যেন পাইপটির উপরের ছিদ্রবিহীন ১০ সেমি মাটির উপরে থাকে, যাতে সেচের পানির সাথে খড়কুটা বা আবর্জনা পাইপের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। নিচের ছিদ্রযুক্ত ১৫ সেমি অংশ মাটির নিচে থাকবে, যাতে মাটির ভিতরের পানি ছিদ্র দিয়ে সহজে পাইপে প্রবেশ করতে পারে বা বেড়িয়ে যেতে পারে। এক একর পরিমাণ সমতল ধান ক্ষেতে ২-৩টি পাইপ থাকা বাঞ্ছনীয়।

চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর থেকেই এডব্লিউডি পদ্ধতিতে সেচ প্রদান শুরু করতে হবে। প্রতি সেচে ৫-৭ সেমি গভীরতায় সেচ দিতে হবে। অতপর পানির স্তর কমতে কমতে পানির গভীরতা যখন পাইপের ভিতর ১৫ সেমি নিচে নেমে যাবে অর্থাৎ পাইপে তলার মাটি দেখা যাবে তখন আবার সেচ দিতে হবে। এ অবস্থায় আসতে মাটির প্রকার ভেদে ৫-৮ দিন সময় লাগে। এ ভাবে থোড় অবস্থা আসা পর্যমন্ত সেচ দিয়ে যেতে হবে। থোড় অবস্থার পর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে ২-৪ সেমি বা ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। ধানের এ স্তরে কোন অবস্থাতেই পানির ঘাটতি হতে দেয়া যাবে না। তারপর পুনরায় এডবিস্নউডি পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করতে হবে। তবে ধান কাটার দুই সপ্তাহ পূর্ব সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। তা না হলে ধান পাকতে বিলম্বিত হবে। এ পদ্ধততে সেচ দিলে শতকরা প্রায় ২০-২৫ ভাগ পানি কম লাগে, যার ফলে সেচের খরচ একর প্রতি প্রায় এক হাজার টাকা কমে যায়। এ সেচ পদ্ধতিতে ধানের ফলনের কোন তারতম্য হয় না। উপোরন্ত পানি ও জ্বালানী সাশ্রয় হয় অর্থাৎ কম খরচে বেশি লাভ। সর্বোপরি এটি একটি পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও সহজে তৈরি করা যায় এবং ব্যবহারযোগ্য।

১৫. সেচের পানি ব্যবস্থাপনা

ফসলের জমি পর্যন্ত পরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সেচের পানি পৌঁছিয়ে দেয়াকে পানি ব্যবস্থাপনা বলে। সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কলাকৌশল নিম্নে উল্লেখ করা হল-

সরবরাহকৃত পানির পরিমাণ নির্ধারণ

পরিমাণমত পানি সরবরাহের মাধ্যমে সেচের অপচয় রোধ করা সম্ভব। প্রতিটি সেচ প্রকল্পে মাটির প্রকারভেদে ও ফসলের চাহিদার উপর নির্ভর করে যে পরিমাণ পানির প্রয়োজন তাহা পরিমাপ করে সরবরাহ করা উচিত। তা না হলে পানির অপচয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং প্রকল্প এলাকার সমস্ত জমিতে ফসলের চাহিদানুযায়ী পানি সরবরাহ করা যাবে না। পানির পরিমাণ নির্ধারণ করার পূর্বে আরো যে বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন তা হচ্ছে-

ক.সরবরাহকৃত ফসলে পানির চাহিদা কতটুকু এবং

খ.পানির উৎস থেকে ফসলের জমি পর্যন্ত পানি নিতে কি পরিমাণ অপচয় হবে।

প্রকল্পে বা জমিতে কতটুকু সেচের পানির দরকার তা নিম্নের ফর্মুলার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়, যেমন-প্রকল্পে সেচের প্রয়োজন (Farm Irrigation Requirement) মিমি={বাষ্পীভবন (Evapotranspiration) + নিঃস্বেদন (Seepage & Percolation)} – {কার্যকর বৃষ্টিপাত (Effective rainfall)+ সেচের পানির অপচয় (Irrigation water losses)} ।

উপযুক্ত নালা তৈরির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা

সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার জন্য নালার যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও তৈরির দরকার। নালা নকশা তৈরি করার পূর্বে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো সমবন্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

ক. নালার মধ্যে পানির স্রোত এমন হওয়া উচিত যেন নালার দুই পাশ ভেঙ্গে না যায় এবং নালার নিচে তলানি না পড়ে।

খ. নকশানুযায়ী যতটুকু পানি বহন করার কথা ততটুকুই যেন বহন করতে পারে।

গ. হাইড্রোলিক গ্রেড লাইনের যথাযত সমতা বজায় রাখা।

ঘ. স্থায়ী পার্শ্বস্থ ঢালু এবং

ঙ. পারম্ভিক কম খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬. পর্যায়ক্রমে সেচ

ধানের ক্ষেতে যে সেচ দেয়া হয়, সাধারণত ঐ পানি চুঁয়ে, বাস্পীভবন এবং পাতার মাধ্যমে নিঃস্বরন ইত্যাদির মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়। এ হিসেবে জমিতে মাটি ও ঋতু ভেদে প্রতিদিন ৮-১৫ মিমি পানির প্রয়োজন হয়। তাই জমিতে একবার ৫-৭ সেমি পানি দিলে ৫-৬ দিন আর সেচের দরকার হয় না। পর্যায়ক্রমে সেচ প্রদান করা হলে পানির অপচয় রোধ করে সেচের এলাকা বৃদ্ধি করা সম্ভব। উক্ত পদ্ধতিতে সেচ দিলে ফলনের কোন ক্ষতি হয় না উপোরমত্ম এ পদ্ধতিতে সেচের ফলে শতকরা ২০-৩০ ভাগ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যমত্ম পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব।

১৭. সেচের পূর্বে করণীয়

সেচ আরম্ভ করার পূর্বে সেচ তালিকা (সিডিউল) তৈরি করা উচিত। বিশেষ করে সেচ প্রকল্পে কোন দিন, কোন সময়, কোন জমিতে সেচ দিতে হবে তার উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে। পানি বিতরণ এবং মাঠ নালার সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কৃষকের নিজ দায়িত্বে করা উচিত। সমবায় সমিতির মাধ্যমে করতে পারলে কাজগুলো সহজতর হয়। এমনভাবে সিদ্ধামত্ম নিতে হবে যেন প্রতিটি জমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে পানি পায়। ভাল বীজ ও সারের পাশাপাশি পরিমাণমত সেচ না দিলে কাঙ্ক্ষিত ফলন আশা করা যায় না। তাই বলে ধানের জমিতে সবসময় ৫-৭ সেমি পানি ধরে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। জমিতে সর্বদা দাঁড়ানো পানি রাখলে কুশির সংখ্যা কমে যায়। তাছাড়া গন্ধক ও দস্তার অভাব দেখা দিতে পারে এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সবসময় দাঁড়ানো পানি না রেখে, একবার সেচ দেয়ার পর পর্যায়ক্রমে ৩ দিন শুকনো রেখে পুনরায় সেচ দিলে প্রায় ৩০ ভাগ সেচের পানি সাশ্রয় হয় এবং তাতে ফলনের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। তাছাড়া, চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রেখে পরে অডউ পদ্ধতি অনুসরণ করে থোড় আসা পর্যন্ত সেচ দিতে হবে। তারপর থোড় অবস্থা থেকে দুধ আসা পর্যমত্ম ছিপছিপে পানি রেখে পরে আবার অডউ পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে। তবে ধান পাকার ১৫ দিন পূর্বে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। তা না হলে ধান পাকতে বেশি সময় লাগবে। এভাবে বোরো ধানে প্রায় ৩০ ভাগ সেচের পানি সাশ্রয় করা যায় এবং তাতে ফলনের কোন তারতম্য হয় না।

সার প্রয়োগের আগে জমি থেকে পানি কমিয়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং ২-৩ দিন পর আবার পানি দিলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। গন্ধক ও দসত্মা সারের অভাব দেখা দিলে জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলতে হবে। তবে দানাদার কীটনাশক প্রয়োগকৃত জমিতে পানি ধরে রাখলে দানাদার কীটনাশকের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

১৮. ধান গাছের জীবন পর্যায় ও সময় অনুসারে পানির প্রয়োজনীয়তা

ধান চাষে সার ও অন্যান্য উপকরণের অভাবে কিছুনা কিছু ফলন পাওয়া যবে, তবে পানির অভাবে মোটেও ফলন পাওয়া যাবে না এমনকি ধান চাষ করাই সম্ভব নয়। অতএব, ধান চাষে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নত ধান চাষে পানি ব্যবস্থাপনা ধান গাছের জীবন পর্যায় ও স্তর ভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে। কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে ধান গাছের বিভিন্ন সময়ের গুরুত্ব অনুসারে সঠিক পরিমাণ পানি প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। কারণ বীজ অংকুরোদগম থেকে ধান কর্তন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় এবং স্তরে সঠিক পানি প্রয়োগের সাথে ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। তাই ধান গাছের প্রতিটি পর্যায় এবং স্তর সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ধান গাছের জীবনচক্রের ৩টি পর্যায় ও ১১টি সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

জীবন পর্যায় সমূহ		স্তর সমূহ
ক.	দৈহিক বর্ধনশীল পর্যায়ঃ	অংকুরোদগম স্তর চারার স্তর, রোপণোত্তর কাল ও কুশি স্তর
খ.	প্রজনন পর্যায়ঃ	কাইচথোড় অবস্থা, থোড় বা গর্ভ অবস্থা, ছড়া বা শিষ বাহির হওয়ার সময় ও ফুল ফোটার স্তর।
গ.	পরিপক্ক পর্যায়ঃ	দুধ অবস্থা, চাল জমাট বাধার স্তর ও পুরোপুরি পাকার সময়।

পানির অভাবে ধানের ফলন কমে যায়। তবে বিশেষ কয়েকটি স্তরে মাটিতে পানি বা রসের অভাব হলে ধানের ফলন মাত্রাতিরিক্ত হারে কমে যায়। এদের মধ্যে রোপণোত্তর কাল, কাইচথোড়, গর্ভ অবস্থা, শিষ বাহির হওয়ার স্তর, ফুল ফোটার সময় ও দুধ অবস্থা উলেস্নখযোগ্য। আবার এদের মধ্যে ফুল ফোটা এবং দুধ অবস্থা খরা কাতর বিধায় পানির অভাবে ফলনের বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে। অতএব, ভাল ফলন পেতে হলে এসব সময়ে অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে রস বা ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। কুশি অবস্থায় ছিপছিপে পানির প্রয়োজন নেই, তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন মাটি ফেটে না যায়। ধান কাটার ১৫ দিন পূর্ব থেকে সেচ প্রদান বন্ধ করতে হবে এবং জমির পানি সরিয়ে দিতে হবে। অন্যতায় ধান পাকতে বিলম্বিত হবে।

নিম্নে ১৫০ দিন জীবনকালের একটি উফশী ধানের জাতের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরের পানির প্রয়োজনীয়তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল।

১৫০ দিনের একটি বোরো ধানের জাতের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরে পানির প্রয়োজনীয়তা

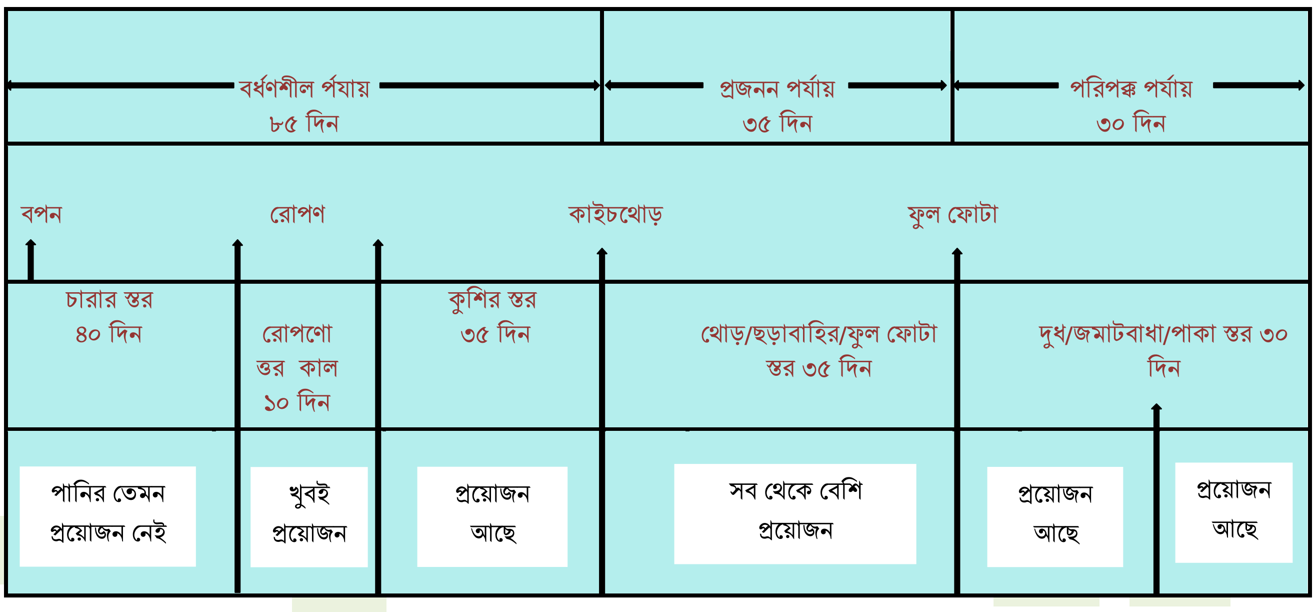

১৯.লবণাক্ত এলাকায় ধানচাষ

জোয়ার-ভাটা উপকূলবর্তী এলাকার নদীর পানি একটি মূল্যবান সম্পদ। কারণ এতদঞ্চলের নদীর পানিতে সবসময় লবণাক্ত থাকে না। শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে। এ সময় নদীর পানি দিয়ে বোরো ধান চাষ করা যায়। বুদ্ধিমত্তার সাথে নদীর পানি ব্যবহার করে বিঘা প্রতি ১২-১৫ মণ পর্যমত্ম ধান উৎপাদন করা সম্ভব।

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার অধিকাংশ নদীর পানি আষাঢ় থেকে ফাল্গুন মাস (জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি যখন পানির লবণাক্ততা ৪ ডিএস/মিটার এর কম থাকে) পর্যন্ত ধানে সেচের জন্য উপযুক্ত থাকে। আর জোয়ারের সময় এসব নদীর পানি জমি থেকে ২-৩ মিটার উচ্চতায় উঠে। তখন পোল্ডার এলাকার স্যুইচ বা ফ্লাশ গেট খুলে দিলে নালার মাধ্যমে সরাসরি জমিতে পানি প্রবেশ করবে। তবে বোরো ধান চাষ করতে হলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির আগেই স্যুইচ গেটের খালে মাঘের মাঝামাঝি (ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে) পানি সংরক্ষণ করতে হবে। এ পানি দিয়ে ফাল্গুন-মধ্য চৈত্র পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারীর মাঝমাঝি থেকে মার্চ) পাম্পের সাহায্যে সেচ প্রদান করে বোরো ধান চাষ করা যায়। তবে এ পদ্ধতির সুবিধা নিতে হলে জোয়ার-ভাটা এলাকায় স্যুইচ গেট সহ পোল্ডার থাকতে হবে। তাছাড়া পানি সংরক্ষণের জন্য খাল বা জলাধার থাকতে হবে এবং এ জলাধারের উপর সেচ এলাকা নির্ভর করবে। জলাধারের পানি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই কৃষকদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। উপকূলবর্তী এলাকার বোরো ধান চাষ পদ্ধতি দেশের অন্যান্য

এলাকার মতই। তবে এ এলাকায় বোরো ধান আগাম চাষ করতে হবে এবং স্বল্প মেয়াদী ধানের জাত যেমন ব্রি ধান২৮ বা ব্রিধান৪৫ চাষ করা উচিত।

২০. বিভিন্ন ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা

ধানসহ অন্যান্য ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা সারণীঃ ১-এ দেয়া হল। অন্যান্য ফসলের থেকে ধানে পানির প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক (৭৫০-১২৫০ মিমি)। তবে তিন মৌসুমের মধ্যে আউশে পানি কম লাগে এবং বোরোতে বেশি। তুলনামূলকভাবে গম উৎপাদনে ধান থেকে পানির পরিমাণ অনেক কম লাগে (৩০০-৪৫০ মিমি)। সরিষা চাষে সব থেকে কম (১৫০-৩০০) পানির প্রয়োজন হয়। অতএব, শুষ্ক মৌসুমে সুপিয় পানির মজুদ রক্ষা ও অপচয় রোধকল্পে ধানের পরিবর্তে পানি সাশ্রয়ী অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করা উচিত।

বিশ্বের সকল দেশে সেচ এলাকায় যেখানে আর্দ্র (বৃষ্টি বহুল ভিজা) এবং শুষ্ক মৌসুম বিদ্যমান, সেখানে প্রথমত আর্দ্র মৌসুমে চাষাবাদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তারপর সেচের পানির সহজলব্যতার উপর নির্ভর করে শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের চিমত্মা করা হয়। অথচ বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমেই অধিক সেচের মাধ্যমে ফসল আবাদ করা হয়ে থাকে এবং আর্দ্র মৌসুমে সম্পূরক সেচের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় না।

বোরো মৌসুম শুষ্ক এবং সেচনির্ভর। তবে বোরোতে ধানের ফলন বেশি হওয়ায় বোরোর আবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বোরোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভূর্গভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিধায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে পরিবেশ বিপর্যের সম্মুখিন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয় রক্ষাকল্পে এবং পানি সাশ্রয়ের জন্য বোরোর আবাদ কমিয়ে বৃষ্টি নির্ভর আমন চাষাবাদ বৃদ্ধি করা উচিত। তাছাড়া ফসল বৈচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষাকল্পে শুষ্ক মৌসুমে ধানের পরিবর্তে পানি সাশ্রয়ী অন্যান্য ফসলের চাষ বৃদ্ধি করা উচিত। এতে করে দেশ আমদানী নির্ভর না হয়ে এবং পানির অপচয়রোধ করে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকেও রক্ষা পাবে।

সারণীঃ ১ ধানসহ বিভিন্ন ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	পানির প্রয়োজনীয়তা	
		মিলি লিটার	লিটার/কেজি
১.	ধান -আউশ -আমন -বোরো	৭৫০-১,৫০০ ৭৫০-৮৭০ ৮৭০-১,০০০ ১,০০০-১,২৫০	২,৫০০-৪,০০০
২.	গম	৩০০-৪৫০	১,০০০-১,৫০০
৩.	ভুট্রা	৫০০-৬২০	৭৫০-৯০০
৪.	আলু	৩৭০-৪৫০	৪৫০-৫০০
৫.	পেঁয়াজ	৩৭০-৫০০	৪৫০-৫০০
৬.	ডাল	৩০০-৩৫০	
৭.	সরিষা	১৫০-৩০০	